সাংবাদিকের দৃষ্টিতে কথামৃত

জয়ন্ত ঘোষাল

সাংবাদিকতা বিচিত্রগামী, তার নানা স্তর। সাংবাদিকতার অন্যতম শর্ত সঠিক তথ্য নির্ভুলভাবে পরিবেশন। পাশাপাশি লেখাটি কোথা থেকে, কোন প্রেক্ষিতে সাংবাদিক লিখছেন—সেগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা বোঝানোর জন্য গবেষণার অন্যতম বিষয়বস্তু হিসাবে কনটেক্সচুয়াল রেফারেন্সকে চিহ্নিত করেছে তার ওপর সবিস্তার গবেষণাও হয়েছে। যদিও অনেকের মতে বর্তমানে ইন্টারনেটের যুগে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ডেটলাইন নামক কনসেপ্টটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে গুগলসার্চ করে যে কোনও জায়গায় বসে যে কোনও অবস্থানের হদিস আজ মানুষ পেতে পারে। দিল্লিতে বসে ইউক্রেনে কী হচ্ছে, তা জানাও এখন খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। তবে সাবেক সাংবাদিকতা বলে, স্থান-কাল-পাত্রের একটি মূল্য সবসময়ই থাকে। সাংবাদিকতায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ব্যক্তি এবং সমাজজীবনের সম্পর্ক। ব্যক্তি ও সমাজজীবনের সঙ্গে আবার রাষ্ট্রজীবনও যুক্ত।

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় কথামৃতে সাংবাদিকতা বা সাংবাদিক শ্রীম, যে-ভূমিকায় শ্রীম-র কৃতিত্ব আলাদা গবেষণার দাবি রাখে।

কথামৃতের রূপকার মাস্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখনীর মধ্য দিয়ে অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের কীভাবে প্রকাশ ঘটেছে আমরা দেখব।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে যখন কথা বলতেন তখন তাঁর মুখনিঃসৃত সেই অমৃতবাণী অনেকেই লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর পার্ষদেরাও কেউ কেউ এ-ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছিলেন। সেইসময় তাঁরা অনেকে ঠাকুরের স্মৃতিকথা লিখেছেনও। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সচেতনভাবে তাঁর কথামৃত রচনার দায়িত্ব শ্রীমর উপরেই অর্পণ করেছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত রচিত হয়েছিল বাইবেলের ঢঙে। তাই 'শ্রীম কথিত' শব্দটি যুক্ত হয়েছিল। আজ আমরা যখন কৃষ্ণকথামৃতের মূল্যায়ন করি, তখন বিস্মিত হই এই ভেবে যে, এই রচনার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা এবং তাঁর জীবনাদর্শের মাহাত্ম্য আমরা খানিকটা হলেও অনুভব করতে পারি। কথামৃত আমাদের জীবনে আধ্যাত্মিক 'উদ্দীপনা'র সৃষ্টি করে।

সাংবাদিকতার যে-বিশেষ গুণগুলির কথা প্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে তার প্রতিটি গুণই কথামৃতে অনবদ্যভাবে প্রকাশিত। পদে পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রীমর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। সাংবাদিকের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য হল পর্যবেক্ষণ। সামনে অনেক কিছু ঘটে গেলেও অনেকে তা দেখেও দেখতে পান না। আবার অনেকে দেখে যখন তা লেখনীতে বর্ণনা করেন, তখন সেই স্থান-কাল-পাত্র সবই যেন ছবির মতো চোখের সামনে ফুটে ওঠে। শ্রীমর পর্যবেক্ষণ যাকে দর্শনের ভাষায় বলা যেতে পারে ইম্পিরিক্যাল স্টাডি, সেটিও কিন্তু তিনি অসম্ভব দক্ষতার সঙ্গে করেছেন।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আর একটি বিষয় শেখানো হয়। সাংবাদিক যখন কোনও ব্যক্তি বা সমাজের বর্ণনা দেবেন তখন তিনি তাঁর নিজের ব্যক্তিসত্তা, ইগো বা জাগতিক অহংকারকে লুক্কায়িত রাখবেন। সেখানে তাঁকে হতে হবে এক 'আন্ডারস্টেটেড অনলুকার'। ঠিক যেভাবে শ্রীমর রচনায় তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি তাঁর চারপাশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেও কখনও নিজের কথা খুব বেশি বলেননি। বহুক্ষেত্রে তিনি নিজেকে শুধুমাত্র 'একজন ভক্ত', কখনও 'মণি', কখনও বা 'মাস্টার' বলে পরিচয় দিয়েছেন। ফলে তাঁর নিজের ইগো বা ব্যক্তিসত্তা কখনই কোথাও উচ্চগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অন্যের কথাকে তিনি সবসময় অধিক মর্যাদা দিয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে কথামৃত সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাংশ : ''সক্রেটিসের সংলাপের আগাগোড়াই প্লেটো। আর আপনি আছেন অন্তরালে। তদুপরি নাটকীয় অংশ অসামান্য সুন্দর।" মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে যে-অসামান্য কাজটি করে গিয়েছেন তার জন্য তাঁকে স্বামীজী বলেছিলেন, ''এক লক্ষ ধন্যবাদ মাস্টার! আপনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে আঘাত করেছেন। হায়! অতি অল্প লোকই তাঁকে বোঝে।" যে-ধর্মীয় তত্ত্ব বা সংবাদ মাস্টারমশাই পরিবেশন করেছেন তা অহংবর্জিত ও নিখুঁত।

কথামৃতের কথোপকথনে দেখা যায় শ্রীম কথা বলছেন। এমন নয় যে তিনি কিছু বলেননি, বরং তাঁর প্রশ্ন, দ্বিধা, জিজ্ঞাসা—এসবই প্রকাশ পেয়েছে। তবে বক্তার চেয়েও তিনি সেখানে অনেক বেশি শ্রোতা। মুখ্য চরিত্র সবসময়ই শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর চারপাশে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন গৃহী ভক্ত বা সন্ন্যাসী বা সেই সময়ের কলকাতার বিশিষ্ট কিছু মানুষ—তাঁদের নিয়ে তিনি যে-আলেখ্য রচনা করেছেন সেখানে সবসময়েই প্রধান চরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বাকি চরিত্রগুলি তাঁর চারপাশে আবর্তিত হয়েছে।—ঠিক যেমনটি হওয়ারই কথা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ লিখেছেন, পূজ্যপাদ প্রেমেশানন্দজী তাঁর গানে শ্রীমকে 'কথামৃতবরিষণ গৌর জলধর' বলেছেন। কেননা, শ্রীম জলধর মেঘের মতোই শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত বর্ষণ করেছেন। তৃষ্ণার্ত মানবের জন্য বর্ষণ করেছেন সুধাবিন্দু। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সাগরের তীর্থোদক বিতরণ করেছেন তীর্থপিপাসুদের কাছে চরণামৃতের মতো। শ্রীমর আত্মবিনয় এমন সম্পন্ন ছিল যে, তিনি নিজেকে কথামৃত রচয়িতার আসনে বসাননি। তিনি প্রতিবেদক মাত্র—মূল কথাকার শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। তাই তো শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের পরিচয় 'শ্রীম-কথিত।' ''চরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী তুলে ধরেছেন। নিজস্ব সত্তার ছায়া সজ্ঞানে তাতে পড়তে দেননি।" এখানেই কথামৃত রচয়িতার যথার্থ সাংবাদিকসুলভ বৈশিষ্ট্য।

শ্রীম তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিমায় কথামৃত প্রথম প্রকাশ করেছিলেন ইংরেজিতে। তার আগে তিনি

'সচ্চিদানন্দ গীত রত্ন' নামে বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি-সংকলন প্রকাশ করেন। ১৮৯৭ সালে শ্রীম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রণয়নের এই দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনে প্রস্তুত হন। তাঁর ইংরেজিতে লেখা 'A Leaf from the Gospel of Shree Ramakrishna Shisya' নামক দ্বিতীয় পুস্তকটি পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন স্বামী বিবেকানন্দ। এছাড়া বিভিন্নজনের প্রেরণায় বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রকাশের জন্য শ্রীম উৎসাহিত বোধ করেন। তাঁর বর্ণনার একটা নমুনা পর্যালোচনা করব। প্রথম খণ্ডে কলকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মিলনের কথা বলা হচ্ছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ। ''বিদ্যাসাগরের বাটী। আজ শনিবার। শ্রাবণের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি, ৫ই আগস্ট, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। বেলা ৪টা বাজিবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতার রাজপথ দিয়া ঠিকা গাড়ি করিয়া বাদুড়বাগানের দিকে আসিতেছেন। সঙ্গে ভবনাথ, হাজরা ও মাস্টার। বিদ্যাসাগরের বাড়ি যাইবেন।... মাস্টার বিদ্যাসাগরের স্কুলে অধ্যাপনা করেন শুনিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে কি লইয়া যাইবে? আমার দেখিবার বড় সাধ হয়। মাস্টার বিদ্যাসাগরকে সেই কথা বলিলেন। বিদ্যাসাগর আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে একদিন শনিবারে ৪টার সময় সঙ্গে করিয়া আনিতে বলিলেন। একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরকম 'পরমহংস'? তিনি কি গেরুয়া কাপড় পরে থাকেন? মাস্টার বলিয়াছিলেন, আজ্ঞা না, তিনি এক অদ্ভুত পুরুষ, লালপেড়ে কাপড় পরেন, জামা পরেন, বার্নিশ করা চটি জুতা পরেন, রাসমণির কালীবাড়িতে একটি ঘরের ভিতর বাস করেন, সেই ঘরে তক্তপোশ পাতা আছে—তাহার উপর বিছানা, মশারি আছে, সেই বিছানায় শয়ন করেন। কোন বাহ্যিক চিহ্ন নাই—তবে ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না। অহর্নিশ তাঁহারই চিন্তা করেন।

''গাড়ি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি হইতে ছাড়িয়াছে। পোল পার হইয়া শ্যামবাজার হইয়া ক্রমে আমহার্স্ট স্ট্রীটে আসিয়াছে। ভক্তেরা বলিতেছেন, এইবার বাদুড়বাগানের কাছে আসিয়াছে। ঠাকুর বালকের ন্যায় আনন্দে গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন। আমহার্স্ট স্ট্রীটে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর হইল, যেন ঈশ্বরাবেশ হইবার উপক্রম।... বিদ্যাসাগরের বাটীর সম্মুখে গাড়িটি দাঁড়াইল। গৃহটি দ্বিতল, ইংরেজ পছন্দ। জায়গার মাঝখানে বাটী ও জায়গার চতুর্দিকে প্রাচীর। বাড়ির পশ্চিমধারে সদর দরজা ও ফটক। ফটকটি দ্বারের দক্ষিণদিকে। পশ্চিমের প্রাচীর ও দ্বিতল গৃহের মধ্যবর্তী স্থানে মাঝে মাঝে পুষ্পবৃক্ষ। পশ্চিমদিকের নিচের ঘর হইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। উপরে বিদ্যাসাগর থাকেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই উত্তরে একটি কামরা, তাহার পূর্বদিকে হলঘর। হলের দক্ষিণ-পূর্ব ঘরে বিদ্যাসাগর শয়ন করেন। ঠিক দক্ষিণে আর একটি কামরা আছে—এই কয়টি কামরা বহুমূল্য পুস্তক পরিপূর্ণ। দেওয়ালের কাছে সারি সারি অনেকগুলি পুস্তকাধারে অতি সুন্দররূপে বাঁধানো বইগুলি সাজানো আছে। হলঘরের পূর্বসীমান্তে টেবিল ও চেয়ার আছে। বিদ্যাসাগর যখন বসিয়া কাজ করেন, তখন সেইখানে তিনি পশ্চিমাস্য হইয়া বসেন। যাঁহারা দেখাশুনা করিতে আসেন তাঁহারাও টেবিলের চতুর্দিকে চেয়ারে উপবিষ্ট হন। টেবিলের উপর লিখিবার সামগ্রী—কাগজ, কলম, দোয়াত, ব্লটিং, অনেকগুলি চিঠিপত্র, বাঁধানো হিসাব-পত্রের খাতা, দু-চারখানি বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তক রহিয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায়। ওই কাষ্ঠাসনের ঠিক দক্ষিণের কামরাতে খাট-বিছানা আছে—সেইখানেই ইনি শয়ন করেন।...''

এরপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ''সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া একেবারে প্রথম কামরাটিতে (উঠিবার পর ঠিক

উত্তরের কামরাটিতে) ঠাকুর ভক্তগণসঙ্গে প্রবেশ করিতেছেন। বিদ্যাসাগর কামরার উত্তরপার্শ্বে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন; সম্মুখে একটি চারকোণা লম্বা পালিশ করা টেবিল। টেবিলের পূর্বধারে একখানি পেছন দিকে হেলান-দেওয়া বেঞ্চ। টেবিলের দক্ষিণপার্শ্বে ও পশ্চিমপার্শ্বে কয়েকখানি চেয়ার। বিদ্যাসাগর দু-একটি বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছিলেন।

''ঠাকুর প্রবেশ করিলে পর বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ঠাকুর পশ্চিমাস্য, টেবিলের পূর্বপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। বামহস্ত টেবিলের উপর। পশ্চাতে বেঞ্চখানি। বিদ্যাসাগরকে পূর্ব পরিচিতের ন্যায় একদৃষ্টে দেখিতেছেন ও ভাবে হাসিতেছেন।

''বিদ্যাসাগরের বয়স আন্দাজ ৬২/৬৩। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা ১৬/১৭ বৎসর বড় হইবেন। পরনে থান কাপড়, পায়ে চটি জুতা, গায়ে একটি হাত-কাটা ফ্লানেলের জামা। মাথার চতুষ্পার্শ্ব উড়িষ্যাবাসীদের মতো কামানো। কথা কহিবার সময় দাঁতগুলি উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়,—দাঁতগুলি সমস্ত বাঁধানো। মাথাটি খুব বড়। উন্নত ললাট ও একটু খর্বাকৃতি। ব্রাহ্মণ—তাই গলায় উপবীত।''

দৃষ্টান্তটি দীর্ঘ। কিন্তু এই একটি নমুনা থেকেই বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথমত, দক্ষিণেশ্বর থেকে বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়ি পর্যন্ত আসার যাত্রাপথের বর্ণনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজপথ এবং বিদ্যাসাগরের বাড়িটি পাঠকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

সম্প্রতি বিদ্যাসাগরের বাসভবনটি পরিদর্শন করে মনে হয়েছে, আমি যেন সেদিনের ঘটনাটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ কোথা দিয়ে উঠেছেন, কোথা দিয়ে নেমেছেন—প্রতিটি দৃশ্যপট চলচ্চিত্রের মতো স্পষ্ট।

মাস্টারমশাই বিদ্যাসাগরের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সেই কারণে তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যথেষ্ট পরিচয় ছিল। কাজেই ধরে নেওয়া যায়, তিনি বিদ্যাসাগরের বাড়ি এবং বিদ্যাসাগরকে আগে অনেকবারই খুব কাছ থেকে দেখেছেন। হয়তো সেই কারণেই কথামৃতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অন্যান্য বিশিষ্টজনের বর্ণনার তুলনায় বিদ্যাসাগরের বাসভবন পরিদর্শনের ক্ষেত্রে বর্ণনার বিস্তার এবং গভীরতা একটু বেশিই মনে হয়। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ কী পোশাক পরে বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর তখন কোন দিকে মুখ করে বসে ছিলেন এসবই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য শুধু বিদ্যাসাগরের বাড়ির বর্ণনার ক্ষেত্রে নয়, বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণেশ্বরেও ঠাকুর যখন যেভাবে বসেছেন যেমন 'পূর্বাস্য', 'পশ্চিমাস্য'—এমন প্রতিটি ব্যাপার শ্রীম অত্যন্ত নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাছাড়া প্রতিদিনের দিনলিপিতে অনেক সময় শ্রীম তিথি-নক্ষত্র পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। তার ফলে প্রামাণিকতা হয়েছে অবিসংবাদী যা হালের কোনও বিবরণে আমরা খুঁজে পাই না।

এক অভিনব মহা আনন্দের হাটের প্রতিষ্ঠাতা পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। আধুনিক যুগে তিনি আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন এক অনন্ত ভাবময় মহাভাণ্ড। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও তাঁর ভাব জানার সবচেয়ে বড় উৎস হল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত সময়টিতে আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে ঠাকুরের উক্তি, উপদেশ এবং তাঁর লীলার অনেকখানি বিবরণ পাই।

গ্রন্থটিতে বর্ণিত সমস্ত কিছুর যে-সময়সীমা সেটি সর্বসাকুল্যে ১৯৬ দিনের। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত মোট ১৬৫ দিন আর পরিশিষ্ট অনুযায়ী ৩১ দিনের লিপিবদ্ধ বিবরণী ধরলে ১৯৬ দিন। এই হিসাবের মধ্যে অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে একই তারিখের পুনরুল্লেখ দেখা যায়। বছর ভিত্তিক

সংখ্যা নিলে ব্যাপারটি এইরকম দাঁড়ায় : ১৮৮১ সালে পাঁচ দিন, পরিশিষ্ট ছয় দিন। ১৮৮২-তে ষোলো দিন, পরিশিষ্ট তিন দিন। ১৮৮৩-তে বাহান্ন দিন, পরিশিষ্ট দুইদিন। ১৮৮৪-তে ঊনচল্লিশ দিন, পরিশিষ্ট ছয় দিন। ১৮৮৫-তে ঊনচল্লিশ দিন, পরিশিষ্ট পাঁচ দিন। ১৮৮৬-তে চোদ্দো দিন। ১৮৮৭-তে পরিশিষ্ট নয় দিন। ১৮৫৫ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত তিরিশ বছর ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন।

শ্রীম বলেছেন, সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি ইচ্ছামতো শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেতে পারতেন না। শ্রীম কর্তৃক লিপিবদ্ধ এই নির্দিষ্ট দিনের বাইরেও শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকের সঙ্গে অনেকদিন অনেক কথা বলেছেন, অনেক উপদেশ দিয়েছেন নিভৃতে, কখনও বা প্রকাশ্যে। যেখানে যেখানে মাস্টারমশাই উপস্থিত নেই, তার বিবরণ কথামৃতে নেই।

শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল মাস্টারমশাইয়ের ওপর। মা বলেছেন, ''বাবাজীবন, তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোন ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে ওই সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। ওই সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। আমি একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল যে তিনিই ওই সমস্ত কথা বলিতেছেন।'' শ্রীমায়ের কথা অনুসারে বলা যায় যে, মাস্টারমশাইয়ের কাছে বিরাট ঈশ্বরীয় উৎস হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, আর ঠাকুরের ভাবপ্রচারের এক বিরাট মাধ্যম শ্রীম।

প্রত্যেক গুণী সাংবাদিকের রচনার পিছনে থাকে সূত্র (Evidence)। মাস্টারমশাই বলেছেন, কথামৃত রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে 'Three Classes of Evidences'। এই সম্বন্ধে তিন প্রকার উপকরণ পাওয়া যায়। প্রথম, 'Direct and Recorded on the same day'। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসে যা দেখেছেন, শুনেছেন তার বিবরণী সেইদিনই ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন মাস্টারমশাই। এ-জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ (direct) দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত। দ্বিতীয় সূত্র, 'Direct but unrecorded at the time of the Master'। তৃতীয়, 'Hearsay and unrecorded at the time of the Master'। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রণয়নকালে শ্রীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভর করেছিলেন।

কথামৃতের প্রথমেই রচনার Methodology দিয়ে দিয়েছেন মাস্টারমশাই। এর ফলে প্রামাণিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যে-প্রামাণিকতা সাংবাদিকদের প্রতিক্ষণেই দিতে হয়। যদিও অলডাস হাক্সলি কথামৃতকে Hagiography অভিধায় অভিহিত করেছেন তবু আমরা তাকে কেবল সাধুসন্তদের জীবনীগ্রন্থ বলব না, এ হল এক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের ধর্মপ্রচারের অভিযাত্রা—তার সঙ্গে তৎকালের সংবাদ, তৎকালীন সমাজের রূপরেখার প্রতিবেদন।

নিবোধত কার্যালয়ের ছুটির বিজ্ঞপ্তি

৭ মার্চ ২০২৩ মঙ্গলবার দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে কার্যালয় সারাদিন বন্ধ থাকবে।